ইতিহাসের বাউল আর বাউলের ইতিহাস

রাধামাধব মণ্ডল

বাউল নিয়ে লিখতে বসলে মনে পড়ে যায়— বাউল সাধককবি, গীতিকারদের কথা। বাউলতলির এরকম অনেক মানুষ আছেন যাঁদের কণ্ঠে গান, চেতনায় গান। তাঁদের স্বভাবেও গানের মূল সুরটি লুকিয়ে থাকতে দেখা যায় কখনো কখনো। সেই সিরাজ সাঁই লালন থেকে শুরু করে নবনী দাস বাউল, ভবাপাগলা, পূর্ণচন্দ্র দাস বাউল, গোষ্ঠগোপাল, কার্তিক দাস, বাঁকাশ্যাম, সাধন, তারক, অন্ধ কানাই, লক্ষ্মণ, অনন্তের মতো আরও কত জানা-অজানা বাউলকে দেখেছি। তাঁদের স্বভাবের মধ্যেও বাউলের মূল সুরটি লুকিয়ে আছে। 'পারানি' তাঁদের কাছে উদাসী কণ্ঠের উন্মুক্ত গান। যার আশায় আশায় লুকিয়ে আছে 'মোক্ষ' লাভের ধাপ। মুক্তি বাউলদেরই একমাত্র নয়, সমস্ত চেতন জীবনের লক্ষ্য। বাউলদের এই সমস্ত গানের ভাষার বিন্যাস কৌশলরীতি অনেকখানি মার্জিত ও বুদ্ধিদীপ্ত। তবে কোনো কোনো বাউল এর বিপক্ষে দাঁড়িয়ে ভিন্ন মত প্রদান করেন। এইসব মায়াময়, ছায়াময় বাউলকবির অন্তরে অন্তরে উদারতার দাগ কেটে যায়। বাস্তব জীবনের কঠিন সংগ্রামে তাঁরা নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নিজেদের অরূপতাকে জাগ্রত রাখতে তীব্র আবেগে জড়িয়ে ফেলে! ঠিক তখনই শিশুর সরলতা উদিত হয় বাউলদের মনের গহিনে। বাউলরা রহস্যবাদী ভাবে, আবেগে, কল্পনায়, ভক্তিভাবে জড়িয়ে ওঠা রচনারীতির তরল, স্বচ্ছ কৌশলকে অবলম্বন করে এগিয়ে চলে। মনোমোহন দত্ত প্রণীত শত বছরের পুরনো একটি বাউল গানে মেলে—

'যাঁরে দেখ্‌তে আকুল, দেখ্‌বি যদি, শুন্‌ বলি সন্ধান তাঁর,
দ্বিদলেতে দিল্‌ ধরিয়ে, মিল করিয়ে চেয়ে থাক মন আমার।
অরূপ স্বরূপ করে একরূপ, হইয়ে প্রেম লোলুপ,
ভাবরে আরোপের রূপ, ছুটাবে আঁধার।
ফুট্‌বে কলিদীপশিখা, যা আছে সব যাবে দেখা,
তার ভিতরে বাঁকা সখা, দেখা পেতে পার তাঁর,
তারে তারে মিশালে তার, হবে আর এক চমৎকার,

তারের খবর আসবে তারে, জগৎ জোড়া একটী তার।
সাবধানে মন হুস নিয়ে, বক বিড়ালের খাপ্ দেখিয়ে,
চোখ্ মুদিয়ে ধ্যান ধরিয়ে, মন নিয়ে মন বস আমার।
শুন্ বলি কই তোরে ক্ষেপা, ভাবিস্‌নারে সোনা রূপা,
বশ করিয়ে বস অজপা, কৃপা হবে সেই অকৃপার,
মন তোমার নাই চিত্তশুদ্ধি, গেল না তোর ছেলে বুদ্ধি,
কিসে হবে সাধন সিদ্ধি, মনোমোহনের নাই বেপার।'

বাউলের জন্ম ইতিহাস বলে, অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে একদল উদাসী প্রকৃতির মর্ম কথাশ্রয়ী সাধকের উদ্ভব হয়— যাঁরা বাউল নামে পরিচিত ছিলেন। যাঁরা নিজেদের জীবনযাত্রাকে অন্যরকম করে রাখতেন, সমাজের থেকে ভিন্ন পোশাকে ও কর্মে, যাঁরা অনেকগুলি উৎকৃষ্ট দেহতত্ত্ববোধের যন্ত্রণায় 'অধ্যাত্ম সঙ্গীত' রচনা করেছেন তা ওই শতাব্দীর কাছে নতুনের দাবিদার। আর এই 'অধ্যাত্ম সঙ্গীত' রচনা ও প্রচারকেন্দ্রিক একটা উপসম্প্রদায়ের জন্ম হয়— তাঁরাই 'বাউল' নামে পরিচিত। সেকাল থেকে একালেও কিছু শিক্ষিত, সমাজের মান্যিগণ্যি মানুষের চোখে এঁরা সমাদৃত হয়ে এসেছেন। এমনকী এঁদের গানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনেক শিক্ষিত মানুষ নিজেদের জড়িয়ে ফেলেন চর্চার মাধ্যমে, কেউ কেউ গ্রাম্যভাবে ভাবিত হয়ে, এ গানের মতো করে আধুনিক গান বাঁধতে শুরু করেছেন। যার প্রচার ও ব্যাপ্তিতে বিপুল আকারে বিস্তার লাভ করেছে। সেই কবে হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-৯৬) শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হয়ে সর্বপ্রথম বাউল গানের প্রতি আকৃষ্ট হন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেও অনেকগুলি বিখ্যাত বাউল গান রচনা করেন। এই হরিনাথ মজুমদার তো যিনি 'কাঙাল হরিনাথ' বা 'ফিকিরচাঁদ বাউল' নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁর সঙ্গদানে 'জীবনাদর্শে' মুগ্ধ হয়ে সে সময় কিছু তরুণ তাঁর এই বাউল দলে যোগ দিয়েছিলেন বলে জানা যায়।

শিলাইদহে অবস্থান করার সময় (জমিদারি কাজকর্ম পরিদর্শনের ব্যাপারে) রবীন্দ্রনাথ লালনের গানের সংস্পর্শে আসেন এবং ভাব ও ভাষাপ্রেমে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। তখন থেকেই তিনি বাউল প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে লালন ফকিরের গান সংগ্রহ শুরু করেন এবং নিজে অর্থ ব্যয় করে তা প্রকাশ করেন। এক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি রাখলে দেখা যাবে তাঁর কতকগুলি গান যেন পুরনো বাউল গানেরই আধুনিক মার্জিত শব্দরূপ। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন সাহেবও অনেক বাংলা গান সংরক্ষণ করেন। ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বাউল গান সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ, দীর্ঘ শ্রমসাধ্য গবেষণা করেছেন। ফলে এই গানের তত্ত্বাদর্শ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কৌতূহলজনক অনেক তথ্য উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়েছে। তবে সঠিকভাবে বলতে গেলে পরম সাধক রবীন্দ্রনাথের কথা বার বার উঠে আসবে বাউলের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ এদেশে ও বিদেশে বাউল গানকে অনেকখানি জনপ্রিয় করে গেছেন। তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে এ যুগের সুধাকণ্ঠ গায়ক বাউল সম্রাট পূর্ণচন্দ্র দাস। তাঁর কণ্ঠ ধরে দেশে-বিদেশের মাটিতে বাউল

গান ব্যাপক প্রচার পেয়েছে। জনপ্রিয়ও হয়েছে বাউল গান। এ যুগের এক উচ্চাঙ্গের বাউল সঙ্গীত সাধকের পরিচয় মেলে পূর্ণের কণ্ঠে। পূর্ণ দাস বাউলের পিতা নবনীধর দাস বাউলও ছিলেন এক সুধাকণ্ঠ গায়ক, একজন নিমগ্ন বাউল সাধকও। সারাজীবন ধরে তিনি বাউল সাধনার মধ্য দিয়েই জীবন অতিবাহিত করেছেন। পূর্ণ দাসের জন্মস্থান বীরভূমের বিষ্টুপুর গ্রামে। তাই তাঁর গানের মধ্যেও আধ্যাত্ম রসের সঙ্গে, গ্রাম্যরসের সংমিশ্রণ থেকে গেছে। পরে পূর্ণের পূর্ণতা দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। এখন প্রসঙ্গ কথায় ফিরে আসতে চেষ্টা করব— সে যুগে ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা কিছু মানুষ, আর কিছু বাহ্যিক ব্যাপারে উদাসীন মানুষকে বাউল আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়েছিল। আমরা তার নজির পেতে দেখে নেব, কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে' এই অর্থে বাউল শব্দের ব্যবহার। গ্রন্থটির কেন্দ্রীয় চরিত্র স্বয়ং চৈতন্যদেবও নিজেকে বাউল বলেছেন—

'বাউলকে কহি ও লোকে হইল আউল।
বাউলকে কহি ও হাটে না বিকায় চাউল।'

এই অর্থে বলা যেতে পারে চৈতন্য দেবের সমকালে বাস্তব জীবনের প্রতি উদাসীন, বাইরের দেখা শক্তিতে যাঁরা অসম্বন্ধ— এমন এক ঈশ্বরপ্রেমিক, স্বাধীনচিত্ত বিভোর ভক্ত সম্প্রদায়, জাতিচিহ্নহীন ঈশ্বরপ্রেমে (ব্রহ্ম) বিশ্বাসী হয়ে পথে নামতে শুরু করেন প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ বছর আগে, তাঁদের 'বাউল' বলা হয়। এক্ষেত্রে আবার বলা প্রয়োজন 'বাতুল' বা 'ব্যাকুল' থেকে 'বাউল' শব্দটির উদ্ভব হতে পারে। আর এই ভাব উন্মাদ ব্যাকুলতা ঈশ্বরপ্রেমের ফল! আবার অপর একটি শব্দ 'আউল' (আরবি) কিম্বা 'বাউল' শব্দটি (হিন্দি যার আক্ষরিক মানে বায়ুরোগগ্রস্ত) এ শব্দ থেকেও 'বাউল' শব্দের জন্ম হতে পারে বলে ধারণা গবেষকদের। 'আউল' আরবি শব্দটির অর্থ যাঁরা ঈশ্বরের একান্ত সেবক, এককথায় একটু ভিন্ন জীবনযাত্রা কেন্দ্রিক, গৌরিক মনোভাবাপন্ন মানুষজনকেই বাউল বলা হয়। জাতি সম্প্রদায়ের চিহ্ন বিলুপ্ত হলে, ভক্তপ্রেমিকের হৃদয়ে দাবদাহের শূন্যতা আসে নেমে। তখন ভক্তিরস আপ্লুত করে বলে বাহ্যিক আচার প্রথার ভিতরে গিয়ে মানবিক সত্তার উপর। এক্ষেত্রে বাউল নির্জনের পূজারি, ব্যক্তিবোধের নির্জনতায় নেমে এসেছে 'আত্মতত্ত্বে' বিশ্বাসী বাউল শব্দশৃঙ্খল—

'মনরে, আত্মতত্ত্ব না জানিলে সাধন হবে না।'

বাউলরা জাতপাত না মানা বৈষ্ণব। তাঁদের কথায় ফিরে ফিরে আসে জাতের মিলনের মহামন্ত্রবীজ। লোককথায় এই রূপটিকে আমরা ধরে রাখার চেষ্টা করি—

'বাবা হাড়ি, মা ডোম
তবে হবে বোষ্টম।'

হাড়ি নিচু শ্রেণিভুক্ত এক সম্প্রদায়ের মানুষ, ডোমও এমনই একপ্রকার নিচু শ্রেণির মানুষ। তাঁদের মহামিলনের 'সন্তান রূপ' বোষ্টম হতে কোনো বাধা নেই। আর এমন রূপটির লৌকিক নাম 'বাউল'। ব্রহ্মচর্যরা এ সম্বন্ধে তত্ত্ব কী তা বলতে গিয়ে বলেছেন—

'তন্ত্রমন্ত্র ধর্মাধর্ম কর্মাকর্ম যত।
সব ত্যজি পুষ্পরস যজ জানি তত্ত্ব।'

কখনো বা প্রেমভাবের রূপটির বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে গিয়ে বাউল আশ্রিতরা বলেছেন—

'দধি হতে ননী হয় মথনের জোরে
তৈছে কাম মথি প্রেম ভাবেরই ঘরে।
ধীর শান্ত হলে ঘরে বস্তু রাখা যায়।
তবে ত পাইবে ভাই সেই রসময়।'

বাউল সাধকরা সমন্বয়ের সাধক ধরে নেওয়া যেতে পারে। মানুষে মানুষে ভেদ তাঁরা স্বীকার করেন না, বরং বাউলের গানে সামাজিক উপলব্ধি প্রেক্ষাপটে বাস্তবরূপে প্রতিফলিত হয়েছে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের রাষ্ট্রীয় অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, শোষণ এবং অত্যাচারের বিক্ষুব্ধ কথা প্রেমের সরলি রূপে। বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করেছেন মুসলমান, হিন্দু, শৈব, শাক্ত, খ্রিস্টান বা যাদের মত-ধর্মের ভিন্নতা আছে। কিন্তু সাধক বাউলরা মনে করেন মূল তত্ত্বে তারা সকলেই এক। বাউলরা পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী নন, তাঁরা এসব মানেন না। বাউলদের কাছে অর্থাৎ একজন প্রকৃত বাউলের কাছে জাতপাতের ভেদ, শ্রেণিভেদ, লোকাচার, শাস্ত্রীয় বিধি— অস্বীকৃতই শুধু নয়, অবিশ্বাসী। বাউলরা উদারকেন্দ্রিক ভাবাবেগের মতাদর্শে আশ্রিত এবং উন্মুক্ত আকাশ নীল মনের গাঢ় উপাসক। বলতে গেলে এঁরা মানবধর্মে বিশ্বাসী, মানবতার পথিক, প্রেমের পূজারি। বাউল শুধু গানের জন্য গান বাঁধেননি, দেহমনের সুখই যে গানের বিষয় অধিকার করে বসেছে তার ইঙ্গিত বাউলদের বহন করতে দেখি না, তাঁদের গান সাধনারই ইঙ্গিত বহন করে। তাঁদের ভাষায় তাঁরা মনে করে 'অধর চাঁদ' বা ইন্দ্রিয়াত্মক বস্তুজগতের বাইরের অলীকহীন শক্তিকে বাউলতলির পূর্ণ জীবনে উপলব্ধির বিষয় করা সম্ভব। প্রকৃত মনের জন্য 'মনের মানুষ' অবস্থান করেন অধ্যাত্ম জগতের উপলব্ধির পথে। মনুষ্যদেহে তাঁকে উপলব্ধি করতে পারলে মোক্ষ, নির্বাণ বা মুক্তি যা স্বীকার করি, তা পূর্ণভাবে পাওয়ার সহজ উপায় আর এ লাভের ফলে পূর্ণ সৎজ্যোতি প্রাপ্তি হয়। তখন জগৎকেন্দ্রিক পার্থিব সত্তা, সুফি মতে 'ফাণা' হরণ লাভে, প্রাপ্তি লাভ ঘটে, 'সাধক ঈশ্বর প্রেম ভক্তিরস', যাকে সুফিরা বলেছেন 'বাকা'। বাস্তববোধে সীমাবদ্ধ জড়সত্তাকে বিনাশ করে দেহে মনে শুদ্ধি হয়ে ওঠার প্রকৃত লক্ষ বাউল সাধনার মূল কথা। বাউলরা প্রকৃত 'মনের মানুষ' সন্ধান করেন এক্ষেত্রে তাদের দেখা যায় তাঁরা হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ হলে পূজার্চনা থেকে দূরে থাকে, এমনকী মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ হলে রোজা, নামাজ, মসজিদ তাঁদের অগ্রাহ্য বস্তু হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে কাশী-কাবা সম্বন্ধে তাঁরা উদাসীন এমনকী হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে স্বাভাবিক ধর্মীয় ভেদ আছে, তাঁরা তাও মান্য করতে চান না। হিন্দু বাউল সম্বন্ধে সুফি সাধনার পরিভাষা ব্যবহার করেন, অপরদিকে সুফি বাউলও নির্দ্বিধায় যোগতন্ত্রের শব্দানুশীলন করতে ব্যস্ত থাকেন। সহজিয়া সাধনের পথে মানুষকে জানা হল বাউলদের সাধনা। সমাজ জীবনের চিরাচরিত প্রথার মধ্যে এঁরা আবদ্ধ নয়। এঁদের সাধনার লক্ষ্যে বার বার উঠে এসেছে

'মনের মানুষ'-এর খোঁজ। বাউল ধর্ম সাধনার মধ্যে একটি সমন্বয়ী সুর আছে। উপনিষদ, বৈষ্ণব সহজিয়া ও সুফিবাদের মতাদর্শের সঙ্গে বাউলদের গানের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে শশীভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন—

"In the conception of the 'Man of the Heart' of the Baul' we find a happy mixure of the conception of the paramatma of the Upanisadas, the 'sahajiya' of the sahajiyas and substitute conception of the Beloved."

প্রকৃত শব্দ প্রাপ্তির আশায় ভাবিত হয়ে বাউতলির 'নাম' বহন করা মানুষজন, জাতপাতের বেড়া বন্ধন উপচে উপলব্ধির সুখজ্ঞান লাভের ,আশায় অনন্ত উদার বিশ্বাসী মনে পথে নামে। যে পথের গৌরিক ভাবগাঁথা উন্মুক্ত আকাশ, সামাজিক বস্তুবোধ থেকে দূরে সরে গিয়ে মহা সমাধির রহস্যভেদ করতে সাহায্য জোগায়। যেখানে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের কোনো বাধা থাকে না। কেবল মহামুক্তির স্বর্গীয় বিশ্বাস এসে নামে বাউল-বাউলিনীর শরীরে ও মনে। যা সমাধি হতে সাহায্য যোগায়। তবুও কিছু কিছু পোশাকি বাউলদের আমার মতোই বলতে শুনি—

'তোর দেহরসে বাঁধলি বাসা
হীরক জ্যোতি মুক্ত আশা
(তুই) বৃথায় মরলি প্রেম বানায়ে
শরীর দিলি মনও দিলি
শেষে তুই বৈরাগ্য নিলি
নামলি পথে বগলি সাথে
মাধুকরী মিলল না রে, মিলল না
বৃথায় তুই সাজলি বাউল, বাউল হওয়া হল না
খাঁচা মন্ত্রে বাসা ছাড়া
জীবন মন্ত্রে একতারা
তোর দেহরসে বাঁধলি বাসা
হীরক জ্যোতি মুক্ত আশা
পথ হারিয়ে পথে গেলি
পথের সন্ধান পেলি না
বৃথায় তুই সাজলি বাউল, পাগল হওয়া হল না
নিন্দা নিলি পথ হারালি
সন্ধ্যার ডাক পেলি না
তোর বাউল হওয়া হল না।' (২৮.০৫.২০১০)

এ যেন এ বাস্তব পৃথিবীর প্রেমছায়া। কেবল বাহ্যিক রূপ নিয়ে ভদ্র হবার সাজ, ভিতরে তার দাহ দেখাবার তীব্র ইচ্ছা। যা বাউলদেরকে শূন্য পৃথিবীর রূপখেলা চিনিয়ে দেবার ছবি আঁকে, আমরণ এই কামিনী-কাঞ্চনের মোহমায়ায় পড়ে জীবনের বেদ বেদান্ত

অনুসরণ। চিন্তন স্রোতের মাটি পথ ধরে বাঁকা চাঁদের মায়াবী টান বাউল পথের জীবনকে মনে পড়িয়ে দেয়। মুখ থেকে কথা সরে বসে না— যখন ফাঁকা লাউয়ের গাত্র দেওয়ালের অন্তরভেদী তারের সুর আমাদের ঋদ্ধ করে যায়, ভাবায়, ভাসায়... তরল স্নানের পর্ব উতরায় পরম গৌরিক মন্ত্রে। মাধুকরী যে জীবনের শরীর, তা বাউল এমন না হলেও বাউল বলাতে খামতি থাকে না। একটা পূর্ণ বাউল, বাউলতলি আজ দেখার মতো চোখও যেমন নেই, ঠিক তেমনি জীবনের খোঁজও কি পাওয়া সম্ভব? বদ্ধ গায়ত্রীর বৈষ্ণবীয় মন্ত্রে যে জীবন দীক্ষিত, তার পথ ধরে ছবি ভাসাবার অনুভবটি ঠিক বাউলদের বগলিতেই অবস্থান করে। মানব জীবনের স্রোতের নানা পর্যায় অতিক্রম পর্বে সুখ দুঃখ জরা ব্যাধির প্রকোপে পড়তে হয় সাধারণ ভাত কাপড়ের জীবনকে। ঠিক সুখও যেমন জীবনে স্থায়ী হয় না, দুঃখও ঠিক তেমনি জীবনের সঙ্গে নিজেকে মাখিয়ে নিতে পারে না; এই ভেদ বুদ্ধির ঊর্ধ্বে এক যোগভূমির সাধক বাউল সম্প্রদায়। সে সময় আমি এক কবিতার খসড়ায় লিখেছিলাম—

গোপন সাধন বলি হীরাময় গীতে
লালিত্য যৌবন হাসে বাউলীয় শীতে...

ভেকে তুই বাউল হবি— ভিতরেতে আশা
সত্য প্রেম নষ্ট হয়— অভিশাপে সাদা...।

এমনি সে চিত্র। ভাব আর ভাবনার গাঢ়তা না থাকলে জীবনে মার্গ অতিক্রম করা সম্ভবপর নয়। তবুও বাউলরা হরিবস্ত্র গায়ে দিয়ে মাধুকরীর জন্য পথে নামেন, যে পথ অনন্ত সৌন্দর্যে ঢাকা। কখনো গৌরিক ধর্মের ব্রত, কখনো বা হা শূন্যের অন্বেষণ, কখনো বা মনের মানুষের খোঁজে, দিলদরিয়ার মরমিয়া স্রোতে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। সেখানে কাম আর কামনার বাহ্যিক মূল্যবোধ কেবল শূন্যের নৈবেদ্য ভক্তমার্গের এই রূপটি ধরেই, সাধনার লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব। যেখানে প্রেমের শব্দরূপ অকথিত বর্ণনায় নীলাভ সৌন্দর্য ছড়াতে ব্যাকুল। তখন সাদামাটা জীবন পথ বাউলদের হয়ে ওঠে— গুরুদেবের কথায়—

'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ'

কখন না জানি পথের নেশার ঘোরেই লিখেছিলাম সেই 'অরূপরতন' অন্বেষণের শুভ ইঙ্গিতে—

রূপ সাগরের অরূপরতন
চাইলে মেলে না
তবুও মনের পাখি আমার
কথা শোনে না।

সুযোগ পেলেই পাড়ি দিতে
নেই কো মানা তার
হিসাব করে পথ ধরতে
পাগলা হলাম আর।

কাজল কালো নয়ন বুকে
ছবি আঁকছে রোজ;
যে ছবিটা ভরা গেছে
তাই নিয়ে আজ শোক
পাগল রাধা কেঁদে বলে
সব মুছবে জীবন গেলে।

অপরদিকে 'ঋগ্বেদ সংহিতা'-য় মেলে অগ্নিযজ্ঞের স্তুতি—

'অগ্নিমীলে পুরোহিতং
যজ্ঞস্য দেব মৃত্বিজম
হোতারং রত্নধতেমম।'
(ঋগ্বেদ সংহিতা, ১. ১. ১.)

ঠিক যেন বলা যায়, প্রকৃত বাউলদের মতোই, আমি অগ্নির স্তুতি করি, যে অগ্নি পুরোহিত, যজ্ঞের স্বর্গীয় ঋত্বিক বা দেবগণের আহ্বানকারী এবং রত্নদানকারী অথবা রত্নধারণকারী সেই অধীশ্বরকে বোঝানো হয়েছে।

'বাউলদের' বেশভূষার মধ্যেই বোঝা যায় তাঁরা হিন্দু ও মুসলমান এমনকী খ্রিস্টানদের ভাবের মিলনই চায়। তাঁদের একটাই ধর্ম, তা হল মানব ধর্ম— এই ধর্মের মধ্য দিয়ে তাঁরা অলীক বলা বিশ্ব অনুভূতির গতি ও সত্তার জন্য ধর্ম পালনে ব্যস্ত। এ প্রসঙ্গে কবি চণ্ডীদাস বলেছেন—

'সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপর নাই।'

মানুষের অন্তরের যে 'পুরুষ' তিনিই ভগবান। অন্তরের অনন্ত প্রেম দিয়ে তাঁকে পাওয়া যাবে। সত্যি কথা কি মানবদেহের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থান, এই সত্য বাউল শিষ্যদের জানান গুরুরা। যা শিষ্যদের সহায়তা করে সাধনার পথে এগিয়ে যেতে। তত্ত্বজ্ঞানের সাধু, ভাবগ্রাহী ব্যক্তিই একপ্রকার বাউল। ভক্তিপ্রেম, জন্ম-মৃত্যু চক্র, নিরোধ এবং ত্রিতাপ জ্বালার নিবারণ ও তাঁর জন্য পথ উপদেশ গ্রহণের জন্য গুরুর প্রয়োজন। একদিকে জীবন আচার অপর দিকে শিষ্যকে জীবন জগতের জটিল বস্তুক্রিয়ার মধ্যে থাকতে ও কেবল যৌগিক প্রেরণাদানকারী প্রেমময় ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথে। ঠিক সেই সঙ্গে দরকার বাউল মতের অন্তঃশরীরের যৌন যোগাচারের লক্ষণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি জানা। ঠিক তেমনই শ্বাসের নিয়ন্ত্রণ খুব গুরুত্ব পায় এ সাধনার ক্ষেত্রে। গুরুর নির্দেশে শোনা যায় 'সাধনক্রিয়া'য় নিমগ্ন

থাকলে বাউল জীবনে নিঃসন্তানকামী হন। তবে বর্তমানে এ বেশ কমে উঠেছে, বরং উল্টোটাই দেখছি বেশি। তবে এখনও কিছু কিছু এ রীতির পথ অনুসরণ করছেন, তাই বাউলের ইতিহাস ধারাতে দেখা যায় শিষ্যরাই বাউল হয়ে আসছেন পরম্পরা বজায় রাখতে। অপরদিকের একটি ভাবনাকে এখানে তুলে ধরতে চেষ্টা করব। পরম প্রেমময় ঈশ্বরের সাধন পথে বাউলরা হাঁটতে গিয়ে, একটি লোভনীয় জীবন ধারাকে বেছেছেন বলে আধুনিক কালে মনে হলেও, তা কিন্তু নয়— আধুনিকের এই রূপটি বাউল শিল্পীদের মিডিয়াকেন্দ্রিক প্রচার ও প্রসারে ঘটেছে। দূরে সরে গেছে বাউলের প্রকৃত সাধনজীবন। জীবিকার অন্বেষণের সহজলভ্য পন্থা হিসাবে এখন সবাই বাউল সাজছেন। পথে নামছেন। লক্ষ্য জীবন সাধন। তাঁদের কাছে জানা নেই, সত্যিকারের সাধন বৈরাগ্য মার্গ, কৌশল, মাধুকরী বৃত্তির উপাসনাকেন্দ্রিক দীন দয়াময়কে ভোগ নিবেদন প্রথা, পঞ্চঘর ঘোরা, দ্বাদশ অঙ্গে তিলক আহ্নিক প্রথা, জানা নেই রহস্য উপলব্ধির কার্তিকী টহল মন্ত্র। তবুও অক্ষুব্ধ পথেই তাঁরা চ্যানেলের রঙিন মঞ্চে দাঁড়িয়ে দুটো গা দোলান গান গেয়ে বলেন আমি শ্রী অমুক বাউল, আমি শ্রী তমুক দাস বাউল। এক প্রকৃত বাউল বাঁকাশ্যাম দাস প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন— 'এই কারণেই বাংলার বাউলরা এখন মারা গেছে। গায়কীর রংটপ্পা তাঁদের সাধন বিভাব ভুলিয়ে দিয়েছে। তবুও কেউ কেউ বাংলা ভাষার জন্য, প্রকৃত বাউল সাধনার জন্য জীবন পথের পথিক।' কবি শামসুর রহমানকে বলতে শুনি তাই—

'বাঙলা ভাষা উচ্চারিত হলে নিকানো উঠানে ঝরে
রোদ, বারান্দায় লাগে জ্যোৎস্নার চন্দন। বাঙলা ভাষা
উচ্চারিত হলে গৈরিক মাঠে, খোলা পথে, উত্তাল নদীর
বাঁকে বাঁকে, নদীও নর্তকী হয়।'

কবির এমনই লালিত্যলাবণী কথা যেখানে স্বপ্নের নদীও কেমন না জানি নর্তকী হয়ে উঠেছে। সেখানে ভিজে বারান্দায় দাঁড়িয়ে শোনা যায় বাংলার আকাশ কাঁপানো অন্ধ বাউলের একতারার মিঠে গন্ধে— মনের খোলা জানালায় অনুভূতির প্লাবন তোলে। জ্যোৎস্নার গা চড়াট প্লাবন হাওয়ার মাদক মেশানো তীব্র অনুভূতি জীবনের সকালে দাঁড়িয়ে বিকেল মনে করিয়ে দেয়। ভাঙন লাগা হয়ে ওঠে বাউল ঘ্রাণ! ভেদ শূন্যের এমনি তীব্র জ্ঞান যেন, আলোকমালার মধ্যে থেকেও অন্ধকারকে নিয়ে বড্ড ভাবনা খায়। সামাল দেবার শক্তি পথ আমার জানা নেই, জানা থাকলেও এক্ষেত্রে তা ক্রিয়াশীল নয়। কারণ তার জন্য অনুপ্রেমের অনুশীলনেরও দরকার। এ তথ্য উপলব্ধির শিখর যখন ছুঁয়ে ফেলেছে, তখন স্বর্গীয় বার্তায় বাউল অনুভব কথা কেবল বারে বারে ধ্বনিত হতে থাকছে গ্রাম্য বাউলের ভাঙা গলায়। মৃগনাভীর অভেদ রহস্য যেমন নাককে আশ্রয় করে ঘ্রাণে কথা বলে, ঠিক বাউলও তেমন মনের সন্ধানপথে বাঁশি বাজিয়ে ফেরে। বাউল-বাউলিনীর একটি অন্তরাগ সব চিত্রেই সত্যি যেন একাট বিগ্রহের মতো, মন ভরিয়ে দেয়— অনুভবীয় দৃষ্টিতে। মনোময় জগতের উদাসীন তত্ত্বাদর্শ দিয়ে কৌতূহলজনক তথ্য উদ্ধার করেছেন

বাউলের সম্বন্ধে ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়। তাঁর বিষয়টি শুধু বাউল গানের মধ্যেই নিবিড়তা খুঁজে গেছে। তবে এ প্রসঙ্গে বলি পণ্ডিত আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয়ও বাউল নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনাধর্মী তত্ত্ব-তথ্যমূলক জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রেখে গেছেন। এছাড়াও মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন (ঢাকা) সাহেবও অনেক বাউল গান প্রকাশ করেছেন এবং বাউল নিয়ে সুদীর্ঘ আলোকপাত করেছেন।

আবেগ, ভক্তিভাব এবং রচনারীতির সুকৌশলের মধ্যে তাকে রূপকী কথা বলার গা গড়ন— সত্যিই এসবের জন্য বাউল বাংলার চালচিত্রে এক মনোগ্রাহী আবেগের আত্মপ্রকাশ। বাউল সাধনা আবেগে ভাবযোগ এবং অন্তরযোগের সহমিল ঘটিয়েছে। তা ছাড়া সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ প্লাবনতার সহজ, সরল, স্বাভাবিক জীবনকথার মধ্য দিয়ে বাউল লোকপ্রিয় হয়ে উঠেছে। যেখানে মানুষের আত্মকথা, জীবনের একেবারে সংযোগমুখী উদারতার মাঝখানের ছোঁয়া বাউল জ্বলন্ত জীবন ভাবনার চিত্রে দাঁড়িয়ে থাকে। তাঁদের গৌরিক ভাবাবেগের সাধনকথা কুলঙ্গিতেও নিকানো উঠোন নেমে বৈষ্ণবীয় বাউলিনীকে দিনের সর্বনাশা প্রেমডাক শুনিয়ে বসন্ত পথে হাঁটা দেয়। উত্তর থেকে মাটি দেহের সমাধি অবস্থার মতো পূর্বের জাগান কুলঙ্গিতে। যেখানে না চাইতেই জীবাত্মার মাধুকরি জুটে যায়। সারাটা জীবন এই মাধুকরীর জন্য সাধারণ মানুষ কাঙাল হয়ে বড্ড নিরাশা বোধ করেন। তখন স্থিতি কাকে বলে ঠিক মনে করতে পারেন না। বাউল জীবনের এ বিষয়ে অনুভব আমার অনেক দিনের। একবার খুব বেশি যন্ত্রণা যখন আমাকে খেয়ে ফেলে, তখন হাওয়া লাগা কাঁপনে অসুস্থ শরীর কেবলই ভিজিয়ে দেয়। সে সময় একটা কবিতাতে বাউল বোধকে এভাবে ধরেছিলাম—

খলপি দিয়ে তৈরি আমার একচিলতে ঘর
সেথায় বাঁধা আনন্দলহরী বালক কবি বর
লাজে রাঙা নোলক দোলে কবি বউটি পর
অদ্ভুত মূর্ছনা যেন বাউল বাঁধা ঘর।

নিকানো উঠান ছোট্ট কুলঙ্গিতে
মাটির প্রদীপ সরসে তেলে জ্বলছে তেতে
হিসাব মাখা অঙ্গে তিলক গা-মাটি
পরের জন্য কবির বউ শুধুই খাঁটি।

এটাই বাউল সাধনকথা তত্ত্বগান গল্পে
বৈষ্ণবী শুধুই থাকে মায়া জড়া অল্পে
এমনি স্বপ্নের চোখ দুরেতে ছবির নিশানা
আকাশের এইটুক চাওয়াতে আজ আর ভেসো না।

খলপিতে জল ঢাকা ওড়না মাটিগন্ধ মেখেছে সেও
জীবনের এইটুকু কাজ-না বাকিটা রাখবেই কেও
তবুও বলছি আপনে বাউলের পৃথিবীটা বড়
নীরব আকাশ দেখ চোখ কাছে আরও...।

দৃষ্টিটা বাড়াতেই জানো না— এটাই তো অভাব
কাজে নামবার আগে জানাটাই তো স্বভাব
তবুও বাউল বাঁচছে সলতেতে একতারা বাজছে
জীবনের পরিধিটা হাঁটছে দর্শনে বুক ভিজে আসছে।

আস্ফালন বৃথাই আজ করলি কালি মাখা মুখটা ঢাকতে
শেষমেশ ফকিরই হলি—গা কাদা বর্ষাটা মাখতে;
সুর নেই এইটুকু সার কথা বাঁচতে
তাঁর সাথে ভাব আছে কেন জানি আস্তে!

এইসব শুনে নিয়ে কবি বউ তত্ত্বে দর্শন দেখে
বিবেকটা পুড়িয়ে এনে কবি ভাবে কে যেন কাকে;
জীবনের ছবি দেখায়— জীবনের ফটক তোকে
অসুস্থ বাউল দেখে ধোঁয়াতে ঈশ্বর খুঁজছে কাকে।

মানুষই ঈশ্বর বুঝি মানুষই দেবতা
দরবেশে সাঁই হাঁকে তবুও তো
কে বলবে বিশ্বাস থাক মরা এই পৃথিবীতে
সবই অচল যখন ভরে রাখবি কাকে?

(বাউলবউ : ২৩.০৮.২০১০)

সেদিনের সে অনুমান আজও এই মরা পৃথিবীর মানুষকে ঈশ্বরজ্ঞানে সম্মান জানিয়ে আসছে। অচলতার সমগ্র উৎস ঘিরেও না জানি কী একপ্রকার বাউলশূন্যতা কাজ করে। সে সময় বাউলই বাঁচার শক্ত মানে খুঁজে হাজির করে, তখন বিশ্বস্ত মাটিপ্রদীপও 'তাঁর' গর্ভ পুড়িয়ে দানলীলায় নিজের নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তবে এ সব যন্ত্রণার ছোঁয়া ব্যক্তিজীবনে লালন পেলেও, তিনি স্বতন্ত্র, তাঁর সাধনসংগীত সত্যিই প্রাণ কাঁপানো এক ঐশ্বর্য। এ প্রসঙ্গে ব্যক্ত করা অবশ্যক লালন ফকিরের গান শোনেনি এমন প্রেমিক মানুষের এ সমাজে অভাব আছে। যাঁরা শ্রবণ সঙ্গে থাকেন, তাঁরা অবশ্যই ফকির লালনের সাধনসংগীত শুনেছেন। বাংলায় লালনের গানকে লালনগীতিও বলে। ভোলাই শাহ ছিলেন লালন ফকিরের শিষ্য, তাঁর সংগ্রহ থেকে লালনগীতির মূল খাতা পাওয়া যায়। কথাপ্রসঙ্গে

বলে নিই সেই মূল খাতায় ৩০০র মতো আধ্যাত্মিকতা ও উচ্চমার্গের সংগীত রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। লালনগীতিকে বন্ধনমুক্ত সচেতনতার অন্তঃসত্য এক জীবনবেদ প্রবাহ বললে ভুল বলা হয় না।

বাউলদের মধ্যে উনিশ শতকে এক আলোড়ন উঠেছিল, তবুও জানা যায় জীবিতকালে ফকির লালনের গানের তেমন দেশ-বিদেশে প্রচার প্রসার শুরু হয়নি। তাঁর সংগীত ব্যঞ্জনাময় উচ্চবিন্যাসের এক নিগূঢ় দেহতত্ত্ব কথার বন্ধন। বাউলদের মধ্যে মুর্শিদিবাউল আর মায়াবতী বাউল গানের মধ্যে পৃথক পৃথক ধারা লক্ষ করা যায়। তবে সুফি বাউলদের মধ্যে তাঁদের গানের বিশেষ লক্ষণ হল মানবসচেতন বোধ, তাঁদের গানের শব্দ অন্তরে থাকবেই। এক কথায় লালনগীতি ভাববাদী সরলকথার উর্বর ফসলের গোলা। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই, চমকপ্রদ অলঙ্কার যা কৌশলগতভাবে গানের মধ্যে দেহতত্ত্বের মর্মস্পর্শী ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে 'অচিনপাখি'র পথ হেঁটেছেন। ভাব-সাধনার লোকপ্রচার থেকে মর্মরিত আধ্যাত্মিক চেতনাবোধের জীবন প্রতীক লালনের 'অচিনপাখি' রূপক শব্দবন্ধটি।

'হায় চিরদিন পুষলাম এক অচিনপাখি
ভেদ পরিচয় দেয় না আমায় এই খেদে ঝরে আঁখি।...।'

এছাড়াও অপর একটি গানেও লালনকে ব্যবহার করতে দেখি—

'খাঁচার ভিতর অচিনপাখি কেমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।...'

মনবিহঙ্গের এমনই বাঁধনহারা টান, পার্থিব জগৎ সংসার ছেড়ে মুক্তির মহামন্ত্রে চলে যাওয়ার পথে একমাত্র সাথী লালনের আত্মতত্ত্বের নিবিড় গানগুলি। ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ১৫ কার্তিক (ইং ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ, ৩১ অক্টোবর) হিতকরী পত্রিকার সম্পাদক মীর মোশারফ লালন বিষয়ে কিছু তথ্য জানান। শোনা যায় তিনি লালন সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। ১২৯২ বঙ্গাব্দে কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত কাঙাল হরিনাথের 'কাঙালের ব্রহ্মাণ্ডভেদ' গ্রন্থের প্রথম ভাগের প্রথম সংখ্যায় লালন সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য তিনি আমাদের জানান। এছাড়াও ১২৯৬ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৮৯) জ্যৈষ্ঠ মাস নাগাদ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা লালনের প্রতিকৃতিতে তাঁর চেহারা ও বয়স সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট হলেও ধারণা পাওয়া যায়।

বাউল ফকিরের গান আধ্যাত্মিক ও দেহতত্ত্ব বিষয়ে হয়ে থাকে, সেখানে উন্নত মার্গের চেতনার সোপান এই বাউল ফকিরের গান। সত্যি কথা কি লালনের গানে রয়েছে সেই আদর্শও। ধ্বংসগ্রস্ত সমাজের পটে পণ্য নারী, দুরদৃষ্টি পথে নারীর গ্রাস লালনের গানে ধরা পড়েছে।

আত্মপরিধির মঙ্গলসূত্রে লালন তাঁর গানে তুলে এনেছেন সাধনার গার্হস্থ্য দর্শন। সেখানে সময় অসময়ের নানান খেলায় জীবজগৎ মোহময়। আর সেই মোহগ্রস্ততা কাটিয়ে সুনির্দিষ্ট পথ দেখানোর কথা ভুলে গুরুকরণে আশ্রয় নেবার কথা বলেছেন, তবে এ-করণ কি

সিরাজ সাঁই-এর পথে? এ বিতর্কের যবনিকা পাওয়া মস্ত চেতনার নীলমাখা ভাবার্থ পথে লালনের সাধনভাব, ভারী বেদনার শাব্দিক পথে আমাদের স্পর্শ করে ফেরে। যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা তাকালেই, তাঁর বাউল গানের শব্দ-শরীরে খুঁজে পাব—

'সময় গেলে সাধন হবে না
দিন থাকতে দিনের সাধন
কেন জানলে না তুমি
কেন জানলে না।
সময় গেলে সাধন হবে না।

জান না মন খালে বিলে
থাকে না মীন জল শুকালে
কি হবে আর বোধ আল দিলে
মোহনা সুখ নাই।
সময় গেলে সাধন হবে না।

অসময়ে তিসে করে
মিছিমিছি খেটে মরে
গাছ যদি হয় বীজের জোড়ে
ফল ধরে না, তাতে ফল ধরে না।
সময় গেলে সাধন হবে না।

অমাবস্যা পূর্ণিমা হয়
মহাযোগে সে জেনে উদয়
লালন বলে তাহার সময়
দণ্ড রয় না
সময় গেলে সাধন হবে না।'

সত্যিই এ জীবন মায়া! কেবল ঘোরে ঘেরা একটা ভাঁটার পিছন পিছন ঘুরছি আমরা, বাস্তবিকই জোয়ারের খোঁজে আমাদের এই ভাঁটাপথে অন্বেষণ। ঘোরা পথেই মেলে 'বাউল-বোষ্টম', 'আউল-বাউল', 'বাউল-ফকির' পরস্পর কথাগুলির ব্যবহার। মূলত বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমানেই নয়, মুর্শিদাবাদ, নদীয়াতেও এ শব্দের ব্যবহার গ্রামে-গঞ্জে রয়েছে প্রচলিত। বাংলার বেশ কয়েকটি বৈষ্ণবক্ষেত্র, বৈষ্ণবমেলার দিকে নজর রাখলে দেখতে পাব, সেখানেও বৈষ্ণবদের পাশাপাশি বাউলদের সমাবেশ ঘটে। সমাবেশ স্থলের প্রসিদ্ধিতে রয়েছেন এক এক জন সাধু গুরু বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধক। যেমন বর্ধমানের কেতুগ্রামে রয়েছে বৈষ্ণব সাধক গোপাল দাস বাবাজির দধিয়া বৈরাগীতলার আখড়া।

অজয় নদের তীরে দধিয়া গ্রামের সংলগ্ন বৈরাগীতলায় বৈষ্ণব সাধক গোপাল দাস বাবাজির তিরোধান দিবস উপলক্ষে মাঘ মাসের মকর সংক্রান্তির দিন থেকে মাসাধিক কাল ধরে বৈষ্ণবমেলা বসে, শতাধিক আশ্রম, আখড়া বিভিন্ন জেলা থেকে এসে উপস্থিত হয়। সেখানে বহু বৈষ্ণব, বাউল, ফকিরের সমাবেশ ঘটে। প্রায় তিনশো বছর ধরে চলে আসা বৈষ্ণব মেলাটি বর্তমানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে একটি সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়েছে এলাকার মানুষের কাছে। ঠিক তেমনই বর্ধমান জেলার সীমান্তে অগ্রদ্বীপে গোপীনাথের উৎসব ও মেলা হয়, চৈত্র মাসের কৃষ্ণ একাদশীতে। মেলার মূল আকর্ষণ বাউল-ফকিরদের আখড়া ও তাঁদের গান। দুই বাংলার শিল্পীরা এখানে উপস্থিত হন। অপরদিকে বলে রাখা ভালো, বৈষ্ণবদের আখড়াগুলিকে 'শ্রীপাট' বলা হয়ে থাকে। 'শ্রীপাট' থেকেই 'পাঠ' শব্দটি উঠে এসেছে। কাটোয়া থেকে বর্ধমান যাওয়ার পথে ২ কিমি অতিক্রম করে ন্যারোগেজ লাইনের লেভেল ক্রসিংয়ের অদূরে জাজিগ্রামের শ্রীপাটে কার্তিক মাসের গোষ্ঠাষ্ঠমীতে শ্রীনিবাস প্রভুর তিরোধান দিবস উপলক্ষে বৈষ্ণব মহোৎসব এবং দু'দিনের মেলা বসে। বাউল ও কীর্তন গানই এই মেলার প্রধান আকর্ষণ। বীরভূমের কোটাসুর গ্রামে বাউলদের উদ্যোগে নারায়ণচাঁদ গোঁসাইয়ের সাধনসঙ্গিনী খ্যাপা মা-র নামাঙ্কিত আশ্রমটিতে ১৫০ বছর ধরে, ভাদ্র মাসে 'সাধু-গুরু-বৈষ্ণব'দের সেবা চলে আসছে। নজরে আনলে আর একটা জিনিস দেখা যাবে; বৈষ্ণব মানেই নৈষ্ঠিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব নন, জাতি-বৈষ্ণব বা সহজিয়াদের মধ্যেও পড়ে। এঁরা সকলেই প্রধানত কায়াবাদী, দেহ বৃন্দাবনেই এঁদের সাধনস্থল। কায়াবাদীদের সাধনায় 'অনুমানে'র কোনো জায়গা নেই, দেহমধ্যেই তাঁদের 'বর্তমানে'র ক্রিয়াগুণ। দেহ সাধনার গৌরিকস্থল, দেহেই সপ্তসিন্ধু, অধরের আঁধার, দেহের কোনো কিছুই বর্জ্য-তেজ্য নয়; সবই আখড়াধারীদের অন্তবস্তু। বীরভূমের কোটাসুরের মানুষ, বাউল গবেষক ড. আদিত্য মুখোপাধ্যায় বলেছেন, '...বাউলরা সকলেই নিজেদের বৈষ্ণব বলে পরিচয় দেন এ আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। আসলে 'রূপ'— 'রাগ' হয়ে বাউল পৌঁছায় 'ভাবে'। বাউলের বিভিন্ন শুদ্ধ আচরণগুলিই তাঁকে ক্রমশ বৈষ্ণব করে তোলে। ...প্রত্যেক সাধু-বাউলের কাছেই শুনেছি, তাঁরা বৈষ্ণববাউল। 'বাউলবোষ্টম' কথাটিও খুবই প্রচলিত যে এদের ভিন্নত্ব ধরা পড়ে না। আবার বাউলের সাধনসঙ্গিনীকে সব সময়েই 'বোষ্টুমি' বা 'বৈষ্ণবী'ই বলা হয়।' আসলে সবাই যে বৈষ্ণববাউল একথা যেমন সত্য নয়, ঠিক তেমনি বাউল হয়েও অনেকে বৈষ্ণব গুণ পেয়েছেন। তাঁদের কোনো অংশে ছোট করা চলে না। উনিশ শতকে বাউল আর ফকিরকে অনেক অংশে এক করে দেখা হয়েছে। উচ্চবর্ণের মানুষজনের উগ্র অহমিকা নিম্নবর্ণের কায়াসাধকদের গোপন, গুহ্য আচরণবাদের সাধনাকে ছোট করেই দেখেছেন। সেক্ষেত্রে কেবল বাউল-ফকিরিতন্ত্রই নয়, জাতবৈষ্ণব-কর্তাভজা, সহজিয়াস্রোত-সাহেবধনীসহ সমস্ত গৌণধর্মীদের যারাই আশ্রয় দিয়েছিল, তা উচ্চবর্ণদের মনঃপূত হয়নি। সমাজে তাঁরা তাই শত্রুতার কারণে পড়েন। শুরু হয় দমন পীড়ন, লাঞ্ছনা গঞ্জনা, অবজ্ঞা অবহেলার নানাবিধ অসহিষ্ণু জ্বালা। এমনকী নগরবাসী, শিক্ষিত সমাজ, মসীজীবী, পত্রপত্রিকা, মুদ্রণযন্ত্র, প্রতিষ্ঠান, শাস্ত্র, মন্ত্র, মন্দির-মসজিদ, পুরোহিত-মোল্লা

সবই উচ্চশ্রেণির পক্ষে। অন্যদিকে সংসারত্যাগী গ্রাম্য সমাজের পথে-প্রান্তরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা, অসংগঠিত ভাবউন্মাদ বাউল-ফকিররা মিলিতভাবে লড়াইয়ে টিকে থাকার মূল মন্ত্র কণ্ঠের গান আর মনঅচিনের বিশ্বাস। তাঁদের কাছে সাধন দূরে 'অনুমান' আর সাধনলব্ধ 'হল 'দেহধর্ম' যা 'বর্তমান'। নরনারীর দেহ, দেহধর্ম, কামনা-বাসনা, স্বপ্ন-স্বপ্নস্খলন, মুক্তি-পিপাসা-র পরতে পরতে লুকিয়ে রয়েছে মরমিয়া বিশ্বের গহিন রহস্য। তর্কপ্রবণ বাউল-ফকিররা গুরুবাদী, তাঁরা মানবশরীরকে ধরে কায়াসাধনার মধ্য দিয়ে অন্তর্লীনে পৌঁছন।

বাউল এক অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের লোকশিল্প ও শিল্পীর অকৃত্রিম জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে সাধন পথের এক স্বতোৎসারিত শাশ্বত জীবনবেদ অনুভবের 'বর্তমান' দেহ। মর্মগাঁথা তাঁদের সাধন পথের বাণীই বাউল গানের রূপ। তাঁদের যা কিছু অভিজ্ঞতা, যা কিছু সৃজন ভূমিকা, তার মূলে আছে উদাসীন জীবনযাত্রার ভবঘুরে দশা, অভ্যাস আর মননশীল পরিবর্তনের বৈষ্ণবীয় ভাবসাধনার গৌরিকমাটি স্পর্শ। বাউলদের সুরতন্ত্রের স্বাতন্ত্র, ব্যক্তিত্বের সাধন প্রতিভা, আর বিস্ময়কর সুপ্রাচীন গুরুপ্রথা একটা চিত্র দাঁড় করিয়ে দেয়, বাংলার বাউলদের। মাধুকরীর পথে হাঁটা অবস্থায় বাউল-বাউলিনীর চিত্রটি নয়নমুগ্ধকর এক অনিন্দ্য-সৌন্দর্য নির্মাণ করে আমাদের মনের বিভাস পটে।

১৭৬০ সালে রাঢ় বাংলা মীরকাশেমের হাত থেকে ইংরেজদের হাতে হস্তান্তরিত হবার পর ভৌগোলিক সীমার বহু রদবদলের শেষে আজকের বর্ধমান জেলার চিত্রস্থিরটি চিহ্নিত হয়েছে। প্রসঙ্গে বলি হিন্দু সভ্যতার যাবতীয় ধারায় বিধৌত হয়েছে এ জেলার পূর্ণ মাটি। মুসলমান সভ্যতাও প্রবাহিত হয়েছে এর উপর দিয়ে। বর্ধমান জেলা বীরভূমের মতোই মুসলমান, বৈষ্ণব, শৈব, বৌদ্ধ, জৈন, তান্ত্রিক (শাক্ত) ধারায় মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। অনিবার্যভাবেই তার যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে লোকশিল্প ও সংস্কৃতিতে। বৈষ্ণবদের পীঠস্থান হিসাবে বর্ধমান জেলার অবস্থান অনস্বীকার্য। মধ্য যুগে ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির আচার আচরণের নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণশীলতা, শ্রেণি-জাতিগত বিভেদের উপর চৈতন্যদেবের প্রভাবে তার সঙ্গে বৈষ্ণব গোস্বামীদের দ্বারা বিশেষ শিথিলতা এনে দেয়। এ বিষয়ে বর্ধমান জেলা একটি পীঠস্থান, তা মানতেই হবে। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব বৈষ্ণব ধর্মসংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার ঘটাতে অনেকখানি জায়গা করে দিয়েছে। জেলার কালনা, কাটোয়া, শ্রীখণ্ড, অগ্রদ্বীপ, বাঘনাপাড়া, কুলীনগ্রাম, দেনুড়, ঝামটপুর, উজানিনগর, কোগ্রাম, দামুন্যা, আউশগ্রামের সর প্রভৃতি স্থানগুলি বৈষ্ণবতীর্থ ক্ষেত্র হিসাবে গড়ে উঠেছে। অপরদিকে মালাধর বসু, কেশব ভারতী, গোবিন্দ দাস, নরহরি সরকার, লোচন দাস, বৃন্দাবস দাস, মুকুন্দ কবিরাজ, গৌরী দাস, প্রেম দাস, রাজবল্লভ, জ্ঞান দাস, জয়ানন্দ প্রমুখ বৈষ্ণব সাধক কবি, সাহিত্যিক, পৃষ্ঠপোষকদের অবদান বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রসারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বৈষ্ণবদের জেলায় অবস্থিত শ্রীপাঠসহ বর্ধমান জেলায় অবস্থিত বহু বৈষ্ণব-সাধকের তিরোধান দিবস, আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে সেই স্থানে স্থানে উৎসব ও মেলার আয়োজন চোখে পড়বে। শুধু তাই নয়, সেই সব উৎসবগুলি কালক্রমে মহামিলন উৎসবের আকার নিয়েছে। সেখানে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ছাড়াও মুসলমান ধর্মাবলম্বীরাও

মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে এক মিশ্র সংস্কৃতির সন্ধান দেয়। এইসব বৈষ্ণব উৎসবগুলিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর মানুষের সমাবেশে অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায়। 'ন্যাড়া-নেড়ী', বাউল-ফকিরদেরও সমাবেশকে কেন্দ্র করে অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য।

বর্ধমান জেলার নাম সুপ্রাচীন। পুরাণ, মহাভারত এমনকী গ্রিক ইতিহাসেও এ জেলার অস্তিত্ব রয়েছে। পাণ্ডবদের রাজসূর্য যজ্ঞের সময় বর্ধমানের উল্লেখ আছে, যদিও রাঢ়বঙ্গ পাণ্ডববর্জিত দেশ বলে কথিত। শোনা যায় ভগীরথ এই রাঢ়বঙ্গের বুকের উপর দিয়েই গঙ্গাকে নিয়ে সগররাজার বংশকে ব্রহ্মশাপ থেকে মুক্ত করেছিলেন। তাই রাঢ়বঙ্গের সংস্কৃতি আজকের বা দু'চারশো বছরের নয়, বেশ কয়েক হাজার বছরের বলেও ভুল বলা হয় না! বর্ধমান নামেই প্রাচীনত্বের ইতিহাসটি লুকিয়ে রয়েছে। মহাবীর এসেছিলেন রাঢ়বঙ্গের বর্ধমানে সাধনার বা ধর্ম প্রচার করতে কিংবা পরিব্রাজক হিসাবে। এ বিষয়ে তথ্যগত সঠিক কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অপরদিকে জানা যায় রাজস্থানের জৈন মন্দিরে উৎসব উপলক্ষে যোগদান করতে গেছেন পাঁচশোত্তর জৈন সাধু, এই রাঢ়দেশ থেকে। প্রসঙ্গ ওঠে সেসব সাধুদের যদি এখানে কোনো আশ্রয় না ছিল, তাহলে তাঁরা গেলেন কিভাবে? এসব প্রাচীন কথা। কিন্তু সদ্য অতীতের ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়, জেলার ভরতপুরের একটি স্তূপকে ইতিহাসবিদরা পর্যবেক্ষণ করে জানতে পারেন এটি বৌদ্ধদের আমলের নিদর্শন। পরে সেখান থেকে কয়েকটি সুন্দর বৌদ্ধ মূর্তি পাওয়া যায়। এছাড়াও আউশগ্রামের পাণ্ডুক গ্রামের 'পাণ্ডুরাজার ঢিবি' খনন করে সাড়ে চার হাজার বছরের ইতিহাস উদ্ধার করে ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ। এসব থেকেই প্রমাণ হয় বর্ধমান জেলার সংস্কৃতি আজকের নয়— কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন গাঁথা। এ থেকেই বোঝা যায় বর্ধমানে অতীত কালে বৌদ্ধ এবং জৈনদের প্রভাব ছিল। আঝাপুরের দেউল, বৈদ্যপুরের দেউলের ইতিহাস তার প্রমাণ। বৌদ্ধ, জৈনদের পরেই এসেছে শৈব যুগ। এবং তিন ধর্মের মাঝে পরে এক শ্রেণি সমাজে অবহেলিত হয়। তাঁরাই পরবর্তীকালে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে যেতে শুরু করে, সামাজিক নানা কারণে। বাউল-ফকির-দরবেশ-সাঁই-ন্যাড়ানেড়ী তাদের এক একটি অংশ। এ জেলার গুসকরার বাউল কার্তিক দাস এখন প্রসার-প্রচারের ধাক্কায় দেশ-বিদেশ ঘুরে জনপ্রিয় টিভি চ্যানেলে নাম করেছেন। প্রায়ই তাঁর কণ্ঠের বাউল গান শোনা যায় বিভিন্ন চ্যানেলে। এছাড়াও জেলার বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে বাউল চর্চা কেন্দ্র। বিভিন্ন সংগঠন এ কাজের সঙ্গে যুক্ত। কোথাও শিল্পী-সাহিত্যিক কোথাও বা প্রান্তিক রাঢ়ের কোনো গবেষক মানুষ এ কাজে যুক্ত। বর্ধমান জেলার কাটোয়া এলাকা ছাড়া এ ধরনের সংস্থা বেশি চোখে পড়বে কয়লাখনি এলাকার বিভিন্ন গ্রাম-গঞ্জের পাশে। যেমন : দুর্গাপুর, শিবপুর এলাকার গৌরবাজারের কাছে উত্তম দাস বাউলের তৈরি 'আরশিনগর' বাউল চর্চা কেন্দ্রটির কথা বিশেষ ভাবে এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও রয়েছে ওই এলাকাতেই 'প্রাণের বাগান' বলে একটি বাউল আখড়া। যদিও এই অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেশ কযেকটি বাউল চর্চা কেন্দ্র হালফিল সময়ে গড়ে উঠেছে। এবং এইসব চর্চা কেন্দ্রগুলিতে নিয়মিত বাউলের আসর বসে।